৫৫

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 22 NOV 1997
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

# শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রাধিকার বিষয়ে কতিপয় চিন্তাভাবনা

সক্ষম হবে। শিক্ষার বিষয়বস্তু এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যা জীবনধর্মী ও ব্যবহারযোগ্য শিক্ষায় শিক্ষিত মানবসম্পদ সৃষ্টি করবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কেও অবহেলা করা যাবে না বৈকি?

**শিক্ষাদান পদ্ধতি :** আমাদের দেশের শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া একেবারেই যুগোপযোগিতা হারিয়ে ফেলেছে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন করে বাস্তবে তা প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া বিদ্যা অর্জনে যে মনোযোগ, উৎসাহ ও নিষ্ঠা থাকা প্রয়োজন তাও বিদ্যার্থীদের মনে জাগরিত করা হচ্ছে না। ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মুখস্থ এবং তোতাপাখির মতো তা উগড়ে দিয়ে পাশ এমনকি প্রথম শ্রেণীতে পাস করা সম্ভব হচ্ছে।

শিক্ষা গবেষকগণ শিক্ষাদানের নানা রকম উচ্চতর অংশগ্রহণমূলক এবং ব্যবহারে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদান পদ্ধতি নির্ণয় করেছেন। আমাদের দেশে বিচার বিশ্লেষণ করে এ সকল পদ্ধতির প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এর মধ্যে যেটি সীমিতভাবে হলেও ব্যবহার করে দেখা প্রয়োজন তা হচ্ছে কো-অপারেটিভ এডুকেশন। যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানসহ প্রায় দশটি দেশে ধীরে ধীরে সম্প্রসারণশীল এই শিক্ষাপদ্ধতিতে প্রথমে ক্লাসে পড়া তার পরের বছর শিল্প কারখানায় কাজ করে লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগ এবং উপার্জন করা। আবার শ্রেণীকক্ষে ফেরত এসে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষার উপাদানকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা শিক্ষা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের সমবায়ে এ পদ্ধতি এদেশে চেষ্টা করলে অনেক ফললাভ হবে বলে মনে করি।

**শিক্ষার মান :** বিষয়টি স্পর্শকাতর হলেও এ সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা, চিন্তাভাবনা এবং আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। যত ভাল নীতিই থাকুক, যত সমৃদ্ধ শিক্ষায় উপাদানের সমাহারই ঘটানো হোক না কেন শিক্ষক যদি ছাত্রছাত্রীর আস্থা অর্জন করে তাদের মনে শিক্ষণীয় বিষয়টিকে গ্রথিত করে দিতে না পারেন তাহলে শিক্ষাব্যবস্থা অবশ্যই মুখ থুবড়ে পড়বে। আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে দৈন্যদশার একটা কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষকতার নিম্নমান। এর বিভিন্ন কারণের মধ্যে প্রশিক্ষণের অভাব এবং উপযুক্ত বেতন ও মানমর্যাদার কথা বলা হয়। কিন্তু সম্ভবত, নিষ্ঠার অভাব ও শিক্ষকতার নিম্নমান এর একটা কারণ হতে পারে। অনেকে বলে থাকেন রাজধানী শহরে কোচিং এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ায় যে প্রাইভেট পড়ানোর নিয়ম চালু আছে তার ফলে কিছু কিছু শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে সময়, শ্রম, মনোযোগ এবং নিষ্ঠা দিতে হয় পারছেন না নতুবা তা দিতে অনীহা প্রকাশ করছেন। অনেকেই বলেন, অনেক শিক্ষক ক্লাসে আসেন বিশ্রাম নিতে। গ্রামে গঞ্জের চেহারাও ভিন্ন নাও হতে পারে। শিক্ষকগণ সাধারণত সামাজিক এমনকি রাজনৈতিক দিক থেকে খুবই প্রভাবশালী হয়ে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে নিজ গ্রামের বিদ্যাপীঠে চাকরিরত অবস্থায় নিজস্ব সময়ে ও ভঙ্গিতে ক্ষণকাল তাঁরা স্কুলে কাটান। একটি দৈনিকে ছাপা পালা করে উপস্থিতির খবরও এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া মোট শিক্ষাবাজেটের যে এক-পঞ্চমাংশ বেসরকারী শিক্ষকদের বেতনের শতকরা আশি ভাগ সমর্থন প্রদানে যায়, তার বিপরীতে অনেক ভুয়া স্কুলের কথা এবং অনেক অস্তিত্বহীন শিক্ষকের ব্যাপারেও শিক্ষা কর্তৃপক্ষ অবহিত আছেন বলে মনে করি

শিক্ষকতার মান রাতারাতি উন্নয়ন সম্ভব নয়। তবে জোরেশোরে শুরু করতে হবে একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও নীতিমালার দৃঢ় পদক্ষেপ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে। প্রয়োজন দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের শিক্ষকতায় আসার জন্য যথেষ্ট আকর্ষণ সৃষ্টি করা। দরকার হচ্ছে কঠোর প্রশিক্ষণ ও মন মানসিকতা সৃষ্টির প্রয়াস। আর যদি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পুরস্কার ন্যায়নীতি ভিত্তিক হয় তাহলে শিক্ষকদের কাছ থেকে ভাল কাজ আশা করা যাবে। প্রাইভেট প্রশিক্ষণে যে খরচ হয় এবং সেশনজটে যে অতিরিক্ত সময় ব্যয় হয় তা যোগ করলে শিক্ষা খরচ কম নয়। এ উপলব্ধি মনে রেখে সমাজকে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকতার মান উন্নয়নে মনোযোগী হতে হবে।

**অপ্রতুল শ্রেণীকক্ষ ও ছাত্র :** শিক্ষকের উচ্চ অনুপাত শিক্ষা সমস্যাকে অসহনীয় করছে। তবে শিক্ষকের বেতন, সুবধাদি ও মর্যাদা এমন হতে হবে যাতে তাঁরা তাঁদের পূর্ণকালীন শ্রেষ্ঠ অবদান মানুষ গড়ার কাজে নিয়োগ করতে নিবেদিত প্রাণ হতে পারেন। মরহুম বিচারপতি এসএম মোর্শেদ যথার্থই বলেছেন বেতন ভাতার পরিমাণ সামাজিক মান মর্যাদা নির্ণয়ে মোটেই অবান্তর নয়।

*পাকিস্তানী আধা উপনিবেশ আমলে ৪টি এবং স্বাধীন বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৪টি শিক্ষা কমিশন/ কমিটি গঠিত হলেও এ সবের রিপোর্ট বাস্তবায়িত হয়নি। কুদরাত-এ খুদা কমিশন যে প্রগতিশীল, আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষানীতির সুপারিশ করেছিল তা হিমাগারে না পাঠিয়ে তার বাস্তবায়ন করা হলে আমরা জাতি হিসাবে বহুদূর এগিয়ে যেতে পারতাম। একটি উন্নয়নশীল তথা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতির মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে প্রতিশ্রুত দেশের শিক্ষানীতির লক্ষ্য হতে হবে একটি উদার, সৎ, দায়িত্ববান, দক্ষ জবাবদিহিতামূলক, আধুনিক ও দূরদর্শী মানবসম্পদ সৃষ্টি করা। এতে করে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সর্বোচ্চ দক্ষতা ও উদ্ভাবনী প্রজ্ঞা নিশ্চিত করা যাবে। সূচনা হবে একটি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর।*

**শিক্ষা ব্যবস্থাপনা :** এই যে এত বড় শিক্ষা সিস্টেম রয়েছে আমাদের দেশে তার ব্যবস্থাপনার দিকটি কিন্তু সবচেয়ে দুর্বল। নিয়োগ, বদলি প্রায়শ মেধা বা যোগ্যতার ভিত্তিতে না হয়ে হয়তো তদ্বির ও দুর্নীতির কারণেই হয়ে থাকে। শিক্ষার উপকরণসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও ব্যবহারের সিস্টেম আছে কি আমাদের। পাঠ্যপুস্তক লিখন, নির্বাচন, মুদ্রণ ও সময়মত বিতরণের ক্ষেত্রে অভাব অভিযোগ সর্বজনীন। সবচেয়ে বড় কথা পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ এবং অসাধুতা উৎসাহী। যেদিন থেকে পরীক্ষা নেয়ার বিষয়টি উপযুক্ত সংরক্ষিত স্থান থেকে গ্রামে গঞ্জে অরক্ষিত অঞ্চলে চলে গেছে, সেদিন থেকেই পরীক্ষাপদ্ধতিটি আস্থাহীনতার শিকার হয়েছে স্বাভাবিকভাবে। তার উপর যোগ হয়েছে দীর্ঘদিনের বিরতি দিয়ে আস্তে আস্তে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা। এই নেতিবাচক পরীক্ষা পদ্ধতি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে সমূলে ধ্বংস করে দিতে উদ্যত। গণ টোকাটুকি এবং তা আদায়ের সমর্থনে আন্দোলন এখন আর লজ্জার নয়। অবিলম্বে থানা পর্যায়ের নিচে সকল পরীক্ষাকেন্দ্র বাতিল করা উচিত। শুরু থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে সকল পাবলিক পরীক্ষা শেষ করার চিন্তা ভাবনা করা উচিত। সঠিকভাবে না হলেও আংশিকভাবে সেমিস্টার পদ্ধতির মাধ্যমে সারা বছর শ্রেণীকক্ষে ফলপ্রসূ কুইজ ও পরীক্ষা নিয়ে চূড়ান্ত পরীক্ষার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা আংশিকভাবে কমানো সম্ভব কিনা তাও নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে এ সম্পর্কে প্রথমে ট্রেনিং অব ট্রেইনার্স এবং পরবর্তীতে ব্যাপকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা কোর্স চালু করা প্রয়োজন। ব্যবস্থাপনার এই শীর্ষ পর্যায়ের অপর্যাপ্ততা সকল পর্যায়ে ব্যাপকভাবে বিরাজমান।

একটি আলাদা শিক্ষা কর্মকমিশন-এর চিন্তা করার সময়টি এখনও আসেনি? একটি আলাদা পরীক্ষা গ্রহণ সংস্থা গঠনের প্রস্তাব কি খুব অযৌক্তিক হবে?

**শিক্ষায় অর্থায়ণ :** অর্থায়ন সম্পর্কে যে কথাটি জোরেশোরে বলা হয় তা হচ্ছে এই যে, আমাদের জাতীয় আয়ের মাত্র শতকরা ২.৩ ভাগ শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হয়। তবে এটা অবশ্যই স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, শ্রীলঙ্কা ছাড়া অন্যান্য দক্ষিণ এশীয় দেশের এ সম্পর্কিত ব্যয় বাংলাদেশের চেয়ে তেমন বেশি নয়। এর মানে এই নয় যে, অর্থ বরাদ্দ বাড়ানোর যুক্তি নেই। অবশ্যই সম্পদ বাড়ানোর কারণ আছে। কিন্তু তার আগে প্রশ্ন করতে হবে যে, অর্থসম্পদ এ গরীব দেশ তার শিক্ষাখাতে নিয়োগ করছে তার সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ ব্যবহার হচ্ছে কি না। সম্ভবত সরকারী খাতের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট খরচের শতকরা ৯০ ভাগই আসে সরকারী কোষ থেকে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে আবহমান কাল থেকেই বেতন কম এবং গত চার বছরে টাকার মানে স্থির হয়ে আছে এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রার মানে পূর্বের বিশ ভাগের একভাগে নেমে এসেছে। এত কম বেতনে উন্নত মানের শিক্ষা দেয়া সম্ভব কিনা সে প্রশ্ন অবশ্যই করা যায়। আর বেতন কম রাখার মূল যুক্তি হচ্ছে দরিদ্র ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুযোগ না কমানোর যুক্তি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে শহরভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ক'জন গ্রামের ছেলেমেয়ে পড়ছে। আর ঢালাও সর্বজনীনভাবে বেতন কম রেখেই কি ইকুইটির ইস্যুটিকে তেমন যুৎসইভাবে দেখাশোনা করা হয়। নাকি দরিদ্র মেধাবানদের জন্য প্রচুর পরিমাণে বৃত্তি এবং সহজ শর্তে শিক্ষাঋণ প্রদানের পদ্ধতি চালু করে উচ্চশিক্ষায় ধাপে ধাপে বেতন বৃদ্ধি করে তা সম্মানজনক পর্যায়ে নিয়ে আসা উচিত। বর্তমান ব্যবস্থায় কিন্তু জনসাধারণের ট্যাক্স-এর পয়সায় শহরের উচ্চবিত্ত ও মুখরশ্রেণীর সন্তানদের লেখাপড়ার খরচে বিপুলভাবে ভর্তুকি দেয়া হচ্ছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে মান উন্নয়ন করতে প্রথমেই যা প্রয়োজন তা হচ্ছে সর্বজনীন জাতীয়ভিত্তিক অঙ্গীকার। সদিচ্ছা ও কৃতসংকল্পতা। যদি জাতীয় ঐকমত্য কোন ক্ষেত্রে এক্ষুণি আনয়ন করা উচিত, ভবিষ্যতে আমাদের সম্মানজনক অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য শিক্ষাক্ষেত্রেই তার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। সম্প্রতি প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতির ফলপ্রসূ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই তা শুরু হতে পারে। শিক্ষাখাতে প্রতিবছরের বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দ ধরা হোক, শুরু হোক শ্রেষ্ঠতম শিক্ষকতা প্রদানের নানা কৌশল ও একাগ্রতার অনুসন্ধান। শিক্ষাক্ষেত্রে দক্ষ, সৎ, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করে ভবিষ্যতের সোনার বাংলা গঠনের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এখনই নেয়া প্রয়োজন।